মহাকাব্যে মন্দোদরী

এক মহীয়সী চরিত্র

পাঁচুগোপাল বক্সি

পুনশ্চ
৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

প্রকাশকের নিবেদন

বাংলা সাহিত্যে, বিশেষ করে প্রবন্ধশাখায় ড. পাঁচু গোপাল বক্সি মহাশয়ের অবদান অনস্বীকার্য। বিষয়বস্তুর অভিনবত্ব ও বৈচিত্র্যে, তত্ত্ব ও তথ্যের সুবিপুল সমাবেশে, মেধা ও মননশীলতার গভীরতায়, বিচার-বিশ্লেষণের নৈপুণ্যে এবং 'জ্যান্ত' ভাষার কমনীয় ভাস্কর্যে তাঁর প্রবন্ধগুলি স্বাতন্ত্র্যের ও চিন্তাশীল পাঠক-পাঠিকাগণের মনোযোগের দাবিদার।

দুহাজার বছরেরও বেশি প্রাচীন অথচ চিরনবীন আমাদের মহাকাব্যদুটির নানা ঘটনা ও চরিত্রকে আপন প্রত্যয়, উপলব্ধি, দৃষ্টিভঙ্গি ও কালচেতনার আলোয় দেখার ও বিশ্লেষণ করার প্রয়াস শুরু হয় নবজাগরণের যুগে মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখের উদ্যোগে। সেই ধারায় প্রশংসনীয় সংযোজন এই গ্রন্থখানি।

জীবনে বর্ণময়তা, যাপনায় বৈচিত্র্য ও রোমাঞ্চ, নারীত্বে বিপন্নতা, অস্তিত্বের সংকট, বিধবা ও সধবা—দুই সত্তার টানাপোড়েন, অন্তর্দ্বন্দ্বের তীব্রতা ইত্যাদি উপকরণের সমাহারে মন্দোদরীও মহাকাব্যের নায়িকা হতে পারতেন। দেশি-বিদেশি সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য নারীচরিত্রগুলির সঙ্গে তুলনামূলক বিচারে রামায়ণের এই স্ত্রীচরিত্রটির অনন্যতাও প্রতিষ্ঠিত। কীভাবে? অনার্যা বলেই কি তিনি প্রায়-উপেক্ষিতা হয়ে থাকলেন? চরিত্রটির অন্তর্নিহিত শক্তি ও সম্ভাবনাই বা কতখানি?—এই সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছেন লেখক ইতিহাস সাহিত্য সমাজবিজ্ঞান ও মনস্তত্ত্বের নিবিড় অনুষঙ্গে। প্রাবন্ধিকের মৌলিক ভাবনায় ও যুক্তিসঙ্গত মূল্যায়নে মূর্তিমতী হয়েছেন যেন আর এক মন্দোদরী। বহুমাত্রিক এই চরিত্রটি আবিষ্কারের আনন্দ ও নতুন চিন্তার রসদলাভ করবেন তন্নিষ্ঠ পাঠক—এই দৃঢ় বিশ্বাস। নমস্কার।

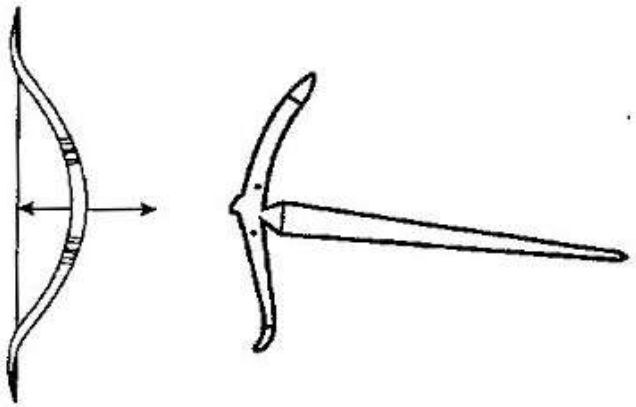

॥ ১ ॥

ছিঃ! ছিঃ! ছিঃ!

আমার সিঁথির সিঁদুর মুছে দিয়েও আপনার সাধ মেটেনি! আমার ইন্দ্রজয়ী পুত্রকে নিরস্ত্র অবস্থায় কাপুরুষের মতো হত্যা করে, আমার মহাবল দেওর ও অসংখ্য বীর যোদ্ধা ও সাধারণ নাগরিককে বধ করে, সোনার লঙ্কাকে শ্মশানে পরিণত করেও আপনার প্রতিহিংসার আগুন নিভল না! আমার ত্রিভুবনজয়ী স্বামীকে কেড়ে নেওয়ার পরেও আমায় ব্যঙ্গ করছেন! শোক-তাপে, অকালবৈধব্যে আমার জীবনটা ছারখার করে দিয়ে মন ভরল না? তার পরেও হানলেন বিদ্রূপবাণ :

'জন্মায়তী হও বলি আর্শীবাদ করি।।'

[কৃত্তিবাসী রামায়ণ, শ্রী বেণীমাধব শীল সম্পাদিত, বৃহৎ অক্ষয়সং পৃ. ৪৮৬]

আমার ওপর বৈধব্য চাপিয়ে দিয়ে বলছেন কিনা, চির-সধবা হও! এতখানি নির্মম নির্লজ্জ আপনি?

হায়! আমার অমন রাজার প্রাণ গেল যাঁর হাতে, যাঁর সম্পর্কে শোনা যায়, 'মনুষ্য নহেন রাম দেব নারায়ণ'; তাঁকে একটি বার নিজের চোখে দেখার ইচ্ছে জেগেছিল। কিন্তু এ কাকে দেখছি? ইনি তো তিনি নন। শুনেছি তিনি ব্রহ্মসনাতন পতিত-পাবন। তাঁর মুখে এমন অশোভন ভাষা উচ্চারিত হতে পারে না। তাঁর মতো অবতারকল্প মহারথী কোনো নিরপরাধা নারীকে প্রকাশ্যে অসম্মান করবেন, প্রধানা রানিকে তাঁরই রাজ্যে বসে অসৌজন্য প্রদর্শন করবেন, সদ্যোবিধবার প্রতি সহানুভূতি না দেখিয়ে তাঁকে নিয়ে তামাশা করবেন—এ কিছুতেই হতে পারে না। আমি স্তম্ভিত! আমি বিভ্রান্ত। আমি সত্যিই হতাশ।

হায়রে! ভুলে গিয়েছিলাম, যিনি আপন পত্নীকে উদ্ধার করার উদ্দেশ্যে অপরের স্ত্রীকে বিধবা করেন, আড়াল থেকে ঐষিক বাণ ছুঁড়ে কিষ্কিন্ধ্যারাজ বালিকে বিনা অপরাধে বধ করেন তিনি আর যা-ই হোন মমতাময় ধার্মিক নন। তা যদি হতেন তাহলে সতী তারাদেবী তাঁকে দিতেন না সেই ভয়ংকর অভিশাপ :

সীতার কারণে তুমি প্রাণ হারাইবে।
এ জন্মের মত দুঃখে কাল কাটাইবে।। [তদেব, পৃ.২২১]

'ক্ষমা কর কপিরাজ' বললেই কি এমন গর্হিত অপরাধ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়? তারাদেবীর শোকের অবসান ঘটে? আপনি আততায়ী না দেবতা? ধিক্ আপনার দেবত্বে! ধিক্ আপনার অবতারত্বে!

বাইরে আপনি যতই শৌর্য-বীর্য ন্যায়ধর্মের বড়াই করুন না কেন, অন্তরে মাঝে মাঝে আতঙ্কে কুঁকড়ে ওঠেন যখন মনে পড়ে, বানররাজ সুষেণের কন্যা, অঙ্গদজননী তারাদেবী শুধু এই ত্রেতা যুগে নয়; পরবর্তী দ্বাপর যুগেও আপনার মর্মান্তিক নিদান হেঁকেছেন :

বিনা দোষে মারিলে যেমন কপীশ্বরে।
মারিবে তোমারে রাম সেই জন্মান্তরে।। [তদেব, পৃ.২২১]

[বাল্মীকি অবশ্য তারার অভিশাপের উল্লেখ করেন নি; রামের আচরণে সুগ্রীবপত্নীর আক্ষেপের কথাই লিখেছেন :

সুগ্রীবস্য বশং প্রাপ্তো বিধিরেষ ভবত্যহো।
সুগ্রীব এব বিক্রান্তো বীর সাহসিক প্রিয়।। [৪]

[রামায়ণম্, কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, ত্রয়োবিংশ সর্গ]

নিহত বালির উদ্দেশে তারা বলেন, প্রিয় সাহসী বীর! রাম সুগ্রীবের বশতাপন্ন হলেন। সুগ্রীব প্রবল পরাক্রমশালী হলেন। এর চেয়ে আশ্চর্যের আর কী আছে?

পরলোকে স্বামীর সঙ্গে মিলনকামনায় শোকাতুরা তারা রামকে বলেছেন :

যেনৈব বাণেন হতঃ প্রিয়ো মে
তেনৈব বাণেন হি মাং জহীহি।
হতা গমিষ্যামি সমীপমস্য
ন মাং বিনা বীর রমেত বালী।। [তদেব,২৪/৩৩]

হে বীর, তুমি যে বাণ নিক্ষেপ করে আমার প্রিয় পতি বালিকে বধ করেছ, সেই বাণের সাহায্যে আমাকেও হত্যা করো। আমি মৃত্যুবরণ করে স্বামীর কাছে যাই। কারণ পরলোকে বালি আমাকে ছাড়া কারও সঙ্গে বিহার করবেন না। গভীর বেদনার সঙ্গে আরও বলেছেন, আমি আর্তা, অনাথা, পতিবিচ্ছিন্না। হাতির মতো মন্থরগতি সেই ধীমান বানরশ্রেষ্ঠ বিশুদ্ধ স্বর্ণমাল্যধারী পতির বিরহে কখনও প্রাণ ধারণ করতে পারি না, সুতরাং তুমি আমায় বধ করো।

বালিপত্নী তারার এই বিলাপ, জিতেন্দ্রিয় ধার্মিক অক্ষয়কীর্তিমান ও ক্ষমাবান বলে

পরিচিত রামচন্দ্রের নির্দয় আচরণে তারার এমন প্রবল অভিমান অভিশাপের চেয়ে কম প্রদাহী নয়।]

মন্দোদরীর চোখে আগ্নেয়গিরির অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। মুখে জ্বলন্ত লাভাস্রোত। কয়েক মুহূর্ত আগে-ও তাঁর শোক ছিল পাগলপারা; দু'চোখে ছিল অবিশ্রান্ত অশ্রুর পাগলাঝোরা

সোনার কোমল অঙ্গ ধূলাতে মগন।
মন্দোদরী কান্দে ধরি স্বামীর চরণ।।

[কৃত্তিবাসী রামায়ণ, শ্রী বেণীমাধব শীল সম্পাদিত, বৃহৎ অক্ষয় সং, পৃ.৪৮৫]

স্বামীকে হারিয়ে তিনি কেমন করে প্রাণ ধারণ করবেন বলে আর্তনাদ করার পাশাপাশি মন্দোদরী শূর্পণখাকে 'শমন' বলে বর্ণনা করে অনুযোগ করেন, বোনের প্ররোচনায় সীতাকে অপহরণ করে আনার জন্যে তাঁর প্রভুর প্রাণ গেল। আরাধ্য শঙ্কর-শঙ্করী বিপন্ন ভক্ত পরম শৈব লঙ্কেশ্বরকে সাহায্য না করায় তিনি 'আপদ পড়িলে দেখ কেহ কারো নয়' বলে অভিমান প্রকাশ করেন। যাঁর শরাঘাতে সপ্ত স্বর্গ ও সপ্ত পাতাল এই চতুর্দশ লোকের বীরদের পতন হয়েছে, সেই মহাবীর সামান্য নর-বানরের সঙ্গে যুদ্ধে প্রাণ হারালেন বলে আক্ষেপ করেছেন মহিষী। বিরহিণী রানি যেন রাক্ষসী নন; পতিব্রতা ভারতীয় রমণী, স্নেহময়ী জননী :

অতুল বৈভব তব গেল অকারণে।
সব ছারখার হৈল তোমার বিহনে।।
পতিপুত্র মরিল কেমনে প্রাণ ধরি।
ধরণী লোটায়ে কান্দে রাণী মন্দোদরী।। [তদেব পৃ. ৪৮৬]

শোকাতুরা পাটরানির ভাবাবেগ এমনই দুর্দম যে তাঁর দশ হাজার সতীনের সান্ত্বনাবাক্যও তাঁকে শান্ত করতে ব্যর্থ :

না কান্দ না কান্দ রাণী মন কর স্থির।
তোমার ক্রন্দনে সবার বুক হয় চির।। [তদেব পৃ. ৪৮৬]

লঙ্কাদ্বীপের চারপাশের সাগরের লোনা জল জমেছে মন্দোদরীর দুচোখে। রাবণের দুই বৈমাত্রেয় ভাই খর ও দূষণ, সহোদর কুম্ভকর্ণ, পুত্র নরান্তক, দেবান্তক, ত্রিশিরা, অতিকায় ইত্যাদি জ্ঞাতির পতন ঘটল। লঙ্কারাজের দুই বীর অনুচর মহাপাশ ও মহোদর, কুম্ভকর্ণের পুত্র কুম্ভ নিকুম্ভ, সেনাপতি মকরাক্ষ নিহত। 'এক লক্ষ পুত্র যার সওয়া লক্ষ নাতি', সেই দশানন যুদ্ধে পাঠাবার উপযুক্ত বীর পাচ্ছেন না—'বীর নাহি লঙ্কাতে, ভাণ্ডারে নাহি ধন।' তাঁর নির্দেশে বিভীষণপুত্র রামভক্ত তরণীসেন, তাঁর ঔরস ও চিত্রাঙ্গদার গর্ভজাত পরম বৈষ্ণব বীরবাহু যুদ্ধ করতে গিয়ে রামের হাতে প্রাণ দিলেন। বীরযোদ্ধা ধূম্রাক্ষ ও ভস্মাক্ষ নিহত হলেন। নিহতদের অনেকেই মন্দোদরীর পুত্রতুল্য বা ভ্রাতৃপ্রতিম। কেউ সবে পোগণ্ড পার হয়েছেন; কারও বা সবে বিয়ে হয়েছে। এই সব স্নেহভাজন প্রিয়জন বা বীরদের একের পর এক অকালমৃত্যুজনিত শোক তাঁর অন্তরে তুষের আগুনের মতো জ্বলছিল। তা লেলিহান শিখায় জ্বলে উঠল মহাবীর মেঘনাদের অসহায় অত্যাকস্মিক অকালমৃত্যু বরণের দুঃসংবাদে :

ভূমিতলে লোটাইয়া, পুত্রশোকে বিনাইয়া
ক্রন্দন করিছে মন্দোদরী।
হায় পুত্র মেঘনাদ, কেন এত পরমাদ,
আজি যে মজিল লঙ্কাপুরী।। [তদেব পৃ. ৪৩২]

মন্দোদরীর বিরহবিধুর মাতৃমূর্তিটি চমৎকার এঁকেছেন মধুসূদন :

হেন কালে সভাতলে উতরিলা রাণী
মন্দোদরী, শিশুশূন্য নীড় হেরি যথা
আকুল কপোতী হায়! ধাইছে পশ্চাতে
সখীদল। রাজপদে পড়িলা মহিষী।

[সপ্তম স্বর্গ, মেঘনাদবধকাব্য]

হনুমানের খড়্গাঘাতে নিহত হয়েছেন মন্দোদরীর গর্ভজাত বীরপুত্র মহীরাবণ (যিনি বিভীষণের ছদ্মবেশে হনুমানকে বোকা বানিয়ে রাম-লক্ষ্মণকে অপহরণ করে যোগাদ্যার সামনে বলিদানের জন্যে পাতালে নিয়ে এসেছিলেন), পৌত্র অহীরাবণ—'অষ্টগোটা বাহু তার চারি গোটা মুণ্ড।' দশাননের উপযুক্ত নাতি!

একের পর এক প্রিয়জনদের হারানোর শোক সংবরণ করে এবং আপনাকে যথাসম্ভব সংযত ও স্বাভাবিক রেখে সেই শোকাতুরা মন্দোদরী শ্রীরামচন্দ্রের সামনে আত্মপরিচয় দান প্রসঙ্গে বলেন :

সংসার অসীমা, যাঁহার মহিমা,
শুনেছ ময়দানব।
যাঁর মহাশেলে, ত্রিভুবন টলে,
লক্ষ্মণের পরাভব।।
তাঁহার নন্দিনী, রাবণ-ঘরণী
নাম মম মন্দোদরী।
এলেম চরণ, করিতে দর্শন,
ত্যজিয়া যে অন্তঃপুরী।।
শুন মহাশয়, জানিনু নিশ্চয়,
তুমি গোলোকের নাথ।
লঙ্কার ঈশ্বরী, নাম মন্দোদরী
কহি যোড় করি হাত।।
দেবের ঈশ্বর, দেব পুরন্দর,
তারে যে বান্ধিয়া আনি।
যেই ইন্দ্রজিৎ, দেবে মানে ভীত,
আমি যে তার জননী।। [কৃত্তিবাসী রামায়ণ, পৃ. ৪৮৬]

মন্দোদরীর কথায় আপন বংশমর্যাদা, বাপের ও শ্বশুরের কুলগৌরব সম্পর্কে সচেতনতা প্রতিফলিত। বংশানুগতির অন্যতম নিয়ন্ত্রক উপাদান জিন [gene]-গত দিক থেকে রাবণ ও মন্দোদরীর কিছুটা সাদৃশ্য দেখা যায়। ব্রহ্মার প্রপৌত্র রাবণ। ব্রহ্মার পুত্র পুলস্ত্য। তাঁর পুত্র বিশ্বশ্রবা বা বিশ্রবা। ধর্মপরায়ণ বিশ্রবা বা পৌলস্ত্যের পুত্র রাবণ। উগ্রস্বভাব অত্যন্ত তেজস্বী রাক্ষস সুমালীর কন্যা কৈকসী বা নিকষা তাঁর মা। অন্যদিকে, মন্দোদরীর পিতা ছিলেন দিতি-পুত্র ময় নামে এক মায়াবী দানব। বিশ্বকর্মার মতো তিনিও ছিলেন অসুরদের অদ্বিতীয় শিল্পী। সহস্র বৎসর ব্রহ্মার তপস্যা করে ময়দানব বর লাভ করেন এবং শুক্রাচার্যের যাবতীয় শিল্প বিদ্যার অধিকারী হন। ঋক্ষবিলের মধ্যে হীরা-পান্না-বৈদূর্যমণি খচিত এক বিচিত্র সুন্দর স্বর্ণময় সাততলা প্রাসাদে তিনি বাস করতেন। পাণ্ডবদের জন্যে তিনি ইন্দ্রপ্রস্থে একটি সুরম্য সভাগৃহ নির্মাণ করেন :

কনক-রচিত চিত্র বিচিত্র নির্ম্মাণ।
নানাগুণযুত যেন দেবতার স্থান।।
চৌদিকে সহস্র-দশ ক্রোশ পরিসর।
সুরাসুর নাগ নর সব অগোচর।।

[কাশীদাসী মহাভারত, শ্রী বেণীমাধব শীল সম্পাদিত, বৃহৎ অক্ষয় সং,পৃ. ২৬৬]

মহাভারতে 'দানবকুলের শ্রেষ্ঠ বিশ্বকর্মা আমি' বলে আত্মপরিচয় প্রদানকারী ময় 'ময়মত' নামে গৃহনির্মাণ শিল্পগ্রন্থ রচনা করে খ্যাতিলাভ করেন।

স্বর্গের অপ্সরা হেমার কন্যা মন্দোদরী—'ত্রিভুবন-জিনি কন্যা রূপেতে মোহিনী'। একদিন লঙ্কারাজ রাবণ দুইভাই কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণকে সঙ্গে নিয়ে মৃগয়া করতে গিয়ে ময়দানবের দেখা পান। তিনি রাক্ষসদের রাজা ও বিশ্রবার পুত্র বলে রাবণ আপন পরিচয় দিলে ময় খুশি হন। বিশ্রবাকে তিনি ভালোভাবেই জানতেন। জানতেন না রাবণের ব্রহ্মশাপের ব্যাপারটা :

গোলোকে বিষ্ণুর দ্বাররক্ষক ছিলেন জয় ও বিজয় দুইভাই। একদিন সনকাদি ঋষিরা বৈকুণ্ঠে বিষ্ণু-দর্শনে এলে দ্বাররক্ষীরা তাঁদেরকে প্রবেশ করার সুযোগ দিতে সম্মত হন নি। এতে ঋষিগণ কুপিত হয়ে দুই ভাইকে মর্ত্যে জন্মগ্রহণের অভিশাপ দেন। জয় ও বিজয় অভিশাপ প্রত্যাহার করে নেওয়ার জন্যে ঋষিদের কাছে কাতর অনুনয় করলে তাঁরা বলেন, 'আমাদের অভিসম্পাত ফিরিয়ে নেওয়া যায় না এবং তা ব্যর্থ হবার নয়; তবে দুই উপায়ে তোমাদের মুক্তি মিলতে পারে। একটা পথ হল, মর্ত্যলোকে ঈশ্বরকে মিত্রভাবে ভজনা করলে সাতজন্মে মুক্তিলাভ এবং দ্বিতীয় উপায়টি হল, ঈশ্বরকে শত্রুভাবে ভজনা করে তিন জন্মে স্বর্গে স্বস্থানে প্রত্যাবর্তন।' দুই ভাই তাড়াতাড়ি মুক্তি পাওয়ার আশায় ঈশ্বরকে বৈরীভাবে ভজনা করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তার ফলে জয় সত্যযুগে হিরণ্যাক্ষ, ত্রেতাযুগে রাবণ এবং দ্বাপরে শিশুপালরূপে জন্ম গ্রহণ করেন এবং বিষ্ণুর অবতার যথাক্রমে বরাহ, শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা নিহত হন। অন্যদিকে, বিজয় সত্যযুগে হিরণ্যকশিপু, ত্রেতায় কুম্ভকর্ণ এবং দ্বাপরে দন্তবক্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন এবং